শতবর্ষে বঙ্গবন্ধু, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাংলাদেশ

জয়দীপ চন্দ

"আমি বিশ্বাস করি সেকুলারিজমে, আমি বিশ্বাস করি গণতন্ত্রে, আমি বিশ্বাস করি সোশ্যালিজমে। ... বাংলাদেশ চারটে স্তম্ভের উপর চলবে – জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এর মধ্যে কোন কিন্তু কিন্তু নাই"। – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৭২

এ বছর বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ। এই উপলক্ষ্যে বছরটি বাংলাদেশে 'মুজিব বর্ষ' হিসাবে পালিত হচ্ছে। ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মতারিখ থেকে ২০২১ সালের ২৬শে মার্চ (১৯৭১ সালের এই দিনটিতে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে সর্বস্তরের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান) পর্যন্ত 'মুজিব বর্ষ' পালিত হবে। সারা দেশে এই বছরটি বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে। এই নিয়ে বাংলাদেশে উৎসাহ, উদ্দীপনার অন্ত নেই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জ আদালতে সেরেস্তাদারের চাকরি করতেন। মাতার নাম সায়েরা খাতুন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ব পুরুষেরা ছিলেন ইরাক থেকে আগত দরবেশ শেখ আউয়ালের বংশধর। জন্মের পর তাঁর নানা শেখ আবদুল মজিদ নাম রাখেন মুজিব অর্থাৎ সঠিক উত্তরদাতা। মা-বাবা তাঁকে ডাকতেন খোকা বলে। তাঁর জীবদ্দশায় 'সঠিক উত্তরদাতা' বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর? বাংলাদেশ কি সেই দিশা ধরে রাখতে পেরেছে? প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় এটাই।

১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতায় আজীবন বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধুর দল থেকে 'মুসলিম' শব্দটা বাদ দেওয়া হয় ১৯৫৫ সালের ২১শে অক্টোবর দলের কাউন্সিল অধিবেশনে। তাঁর লেখা থেকেই পাওয়া যায়, "আমি মানুষকে মানুষ হিসাবেই দেখি। রাজনীতিতে আমার কাছে মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিস্টান বলে কিছু নাই। সকলেই মানুষ" ('অসমাপ্ত আত্মজীবনী')। বস্তুত, ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের প্রথম

বার্ষিকী থেকে বাংলাদেশের যে সংবিধান লাগু হয় তাতে কিন্তু এই কথাগুলোর প্রতিফলন ছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার অব্যবহিত পরে যে সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয় তাতে এই কথাগুলোর ক্রমশ অবলুপ্তি ঘটানো হয়। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' আর 'সমাজতন্ত্র' প্রতিস্থাপিত হয় তথাকথিত 'সামাজিক ন্যায়বিচার' আর 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' দিয়ে। আর ১৯৭৯ সালের সংশোধনীতে বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে) দিয়ে সংবিধানের শুরু ও ১৯৮৮ সালে সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ইসলামকে স্বীকৃতিদানের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের কফিনে পেরেক পোঁতার কাজ সম্পন্ন হয়। কিন্তু এটা কি হওয়ার ছিল?

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৯ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী এই সময়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ৫৭ লাখ। এর মধ্যে ৮৮.৪% মুসলমান জনগোষ্ঠী ও ১১.৬% অন্যান্য জনগোষ্ঠী (হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য)।

জনগোষ্ঠীর তুলনামূলক তথ্য সারণি (আদমশুমারি অনুযায়ী)							
শতকরা	**১৯৫১**	**১৯৬১**	**১৯৭৪**	**১৯৮১**	**১৯৯১**	**২০০১**	**২০১১**
মুসলমান	৭৬.৯	৮০.৪	৮৫.৪	৮৬.৭	৮৮.৩	৮৯.৭	৯০.৪
হিন্দু	২২.০	১৮.৫	১৩.৫	১২.১	১০.৫	৯.২	৮.৫
বৌদ্ধ	০.৭	০.৭	০.৬	০.৬	০.৬	০.৭	০.৬
খ্রিষ্টান	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩
অন্যান্য	০.১	০.১	০.২	০.৩	০.৩	০.২	০.১

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২০০১ ও ২০১১ সালের আদমশুমারির জেলাভিত্তিক তথ্য পাশাপাশি রাখলে দেখা যায়, ১৫টি জেলায় হিন্দু জনসংখ্যা কমে গেছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর কর্মকর্তারা বলেছেন, এসব জেলার হিন্দুরা দেশের অন্য কোনো জেলায় চলে গেছে, পরিসংখ্যান তা বলছে না। অর্থাৎ, অন্য জেলায়ও হিন্দু জনসংখ্যা বাড়েনি। কর্মকর্তারা এদের বলছেন, 'মিসিং পপুলেশন' বা 'হারিয়ে যাওয়া মানুষ'।

বরিশাল বিভাগের কোনো জেলাতেই হিন্দুদের সংখ্যা বাড়েনি। বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা—এই ছয়টি জেলায় ২০০১ সালের আদমশুমারিতে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল আট লাখ ১৬ হাজার ৫১ জন। ২০১১ সালের শুমারিতে সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে

সাত লাখ ৬২ হাজার ৪৭৯ জনে। খুলনা বিভাগের বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা—পাশাপাশি এই তিন জেলায় হিন্দুদের সংখ্যা আগের চেয়ে কমেছে। বিভাগের নড়াইল ও কুষ্টিয়া জেলার প্রবণতা একই। ঢাকা বিভাগের মধ্যে এ তালিকায় আছে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও কিশোরগঞ্জ জেলা। অন্যদিকে রাজশাহী বিভাগের পাবনা জেলায়ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে হিন্দু বাড়েনি। ভোলা জেলায় ২০০১ সালে হিন্দু ছিল ৭২ হাজার ২৭৫ জন। সর্বশেষ শুমারিতে দেখা যাচ্ছে, জনসংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৬১ হাজার ১৬২ জনে।

আবার অন্য আরেকটি বিরুদ্ধ মতও রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর আদমশুমারি সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের পর থেকে এ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আর এখনকার বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা কখনোই দেড় কোটি ছাড়ায়নি। তাদের তথ্য অনুয়ায়ীঃ

সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সংখ্যাবাচক তথ্য সারণি (আদমশুমারি অনুযায়ী)

শতকরা	**১৯৫১**	**১৯৬১**	**১৯৭৪**	**১৯৮১**	**১৯৯১**	**২০০১**	**২০১১**
সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা	৯৭ লাখ ৬ হাজার	৯৯ লাখ ৫০ হাজার	১ কোটি ৪ লাখ ৩৯ হাজার	১ কোটি ১৬ লাখ ৩৩ হাজার	১ কোটি ২৪ লাখ ৩৪ হাজার	১ কোটি ২৯ লাখ ৬২ হাজার	১ কোটি ৩৮ লাখ ৩৯ হাজার

উপরের দু'টি সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মোট সংখ্যা না কমলেও মোট জনসংখ্যার নিরিখে তাদের আনুপাতিক হার অবশ্যই কমেছে। তবে এই কমে যাওয়ার পরিসংখ্যান শুধু পাকিস্তান আমলে কিংবা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরই যে দেখা যাচ্ছে তেমন নয়। বরং ব্রিটিশ আমলেও এই অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক হার কমে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, সেসময় পূর্ব বাংলায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হার ছিলো ৩১ শতাংশ। ১৯৪১ সালে ২৮ শতাংশ। অর্থাৎ ২০ বছরে হিন্দু জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হার কমেছে ৩ শতাংশ। তবে এরপরই হিন্দু জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হার দ্রুত গতিতে আরো কমতে থাকে। ১৯৪১ থেকে ১৯৭৪ এই ৩৩ বছরে হিন্দু জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হার কমে যায় প্রায় ১৫ শতাংশ।

Society Language and Culture

কিন্তু আনুপাতিক হার কমার কারণ হিসেবে বিভিন্ন সমীক্ষায় বলা হচ্ছে যে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 'ফার্টিলিটি রেট' অর্থাৎ জন্মহার কিংবা সন্তান বেশি নেবার প্রবণতা বেশি। বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক গবেষণাগুলোতেও একই মত পোষণ করা হচ্ছে। একদিকে মুসলমান জনসংখ্যা অনেক বেশি, অন্যদিকে তাদের মধ্যে জন্মহারও বেশি। ফলে তাদের আকার যেমন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি মোট জনসংখ্যায় আনুপাতিক হারেও তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়লেও আনুপাতিক হার কমছে।

সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হার মোটামুটিভাবে একই থাকলেও হিন্দু জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হার এত কমছে কেন? উত্তর খুঁজতে গেলে একটাই উত্তর সবজায়গায় পাওয়া গেল, তা হল 'নিরাপত্তাহীনতা'। এই 'নিরাপত্তাহীনতা'র পিছনে একাধিক বিষয় রয়েছে। ১৯৪৭ এর ভারত-ভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাসহ বিভিন্ন কারণে সেসময় পূর্ব বাংলা থেকে হিন্দু জনগোষ্ঠীর অনেকেই ভারতে চলে গিয়েছিলেন। একইভাবে ভারত থেকেও অনেক মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানে চলে এসেছিলেন। ১৯৫০, ১৯৬২ এবং বিশেষ করে ১৯৬৪ সালের ভয়াবহ দাঙ্গা, ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ, এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই 'শত্রু সম্পত্তি আইন' ('এনিমি প্রপার্টি অ্যাক্ট), যার নাম পরিবর্তন করে পরবর্তীকালে 'ভেস্টেড প্রপার্টি অ্যাক্ট', বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্তি, ভারতে ১৯৯২ সালের বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনা ও বাংলাদেশে তার প্রতিফলন, বিভিন্ন নির্বাচনের সময় একাধিক জায়গায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপরে আক্রমণ, ইত্যাদি হিন্দু জনগোষ্ঠীর দেশান্তরি হওয়ার বিভিন্ন কারণসমূহ। বাংলাদেশ ভ্রমণকালে একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে যে, বাংলাদেশে সম্পন্ন হিন্দুজনগোষ্ঠীর অনেকেই পশ্চিমবাংলায় একটা আস্তানা তৈরি করে রেখেছেন। দেখা যাচ্ছে পরিবারের এক ছেলে হয়ত বাংলাদেশে থাকেন, আরেকজন থাকেন পশ্চিমবাংলায়। অর্থাৎ বিপদ বুঝলেই যাতে ভারতে চলে আসা যায়। পরিবারের লোকজনের একটু বয়েস হলেই পুরো পরিবার পশ্চিমবাংলায় চলে আসছেন। সবাই যে তথাকথিত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে পশ্চিমবাংলায় চলে আসছেন তা নয়, কেউ কেউ আবার তাদের সন্তান সন্ততির ভবিষ্যতের নিরুদ্বিগ্ন পরিবেশের জন্য দেশত্যাগ করছেন। এরা তথাকথিত 'ভিটেমাটি ছাড়া' লোকের মধ্যে পড়েন না। মুসলমান জনগোষ্ঠীর অনেকেই আক্ষেপ করে বলেছেন, "ছোটবেলায় যাদের সঙ্গে একসাথে খেলেছি, স্কুলে গেছি তাদের অনেককেই আজ আর দেখতে পাইনা। কোথায় যেন হারিয়ে গেছেন"। এই আক্ষেপ একেবারে সাধারণ মানুষের, কারণ সাধারণ মানুষ শান্তিকামী, সহাবস্থানে বিশ্বাসী, অত প্যাঁচ

Society Language and Culture

পয়জার বোঝেন না। তাদেরকে দাবার বোড়ে করা হয় – কখনও রাজনীতিগত ভাবে, কখনওবা ধর্মীয় জিগির তুলে।

হিন্দু জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তাহীনতার মূল কারণ কিন্তু রাজনীতি। বাংলাদেশ থেকে যেসমস্ত হিন্দু দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন তার পিছনে মূল উদ্দেশ্য তাদের জমি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান দখল করা। কোন কোন সময়ে বেশ কিছু সম্পন্ন বৌদ্ধদের উপরে বিক্ষিপ্ত আক্রমণ হলেও আক্রমণের মূল কেন্দ্রবিন্দু হিন্দু জনগোষ্ঠী। কারণ এখানে ধর্মীয় মোড়কে রাজনৈতিক তাস খেলাটা সুবিধাজনক। প্রচুর সম্পন্ন হিন্দু দেশভাগের সময়ে তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে কপর্দকশূন্যভাবে পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। শুধু দেশভাগের সময়েই নয়, সুযোগ পেলেই তারা দেশ ছেড়েছেন। ১৯৬৫ সালে 'শত্রু সম্পত্তি আইনে' এই ঘটনাকে আইনগতভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়, যার ফলে এই আইনের ধারাবাহিক প্রয়োগে বিশেষত হিন্দু জনগোষ্ঠীর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিকে 'শত্রুর সম্পত্তি' হিসেবে চিহ্নিত করে সেগুলি সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি ও জমি দখল করার জন্য এটি হয়ে ওঠে একটি হাতিয়ার। প্রকৃতপক্ষে 'এনিমি প্রপার্টি অ্যাক্ট' হল পূর্ব পাকিস্তান থাকার সময় তৈরি হওয়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারাবাহিক বৈষম্যমূলক আইনগুলির চূড়ান্ত পরিণতি। এটি স্বাধীন বাংলাদেশে নাম পরিবর্তন করে 'ভেস্টেড প্রপার্টি অ্যাক্ট' ('অর্পিত সম্পত্তি আইন') নামে পরিগণিত হয় এবং একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ১৯৪৮ সাল থেকে সাবেক পূর্বপাকিস্তান এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে থাকা হিন্দুদের জমির ৭৫ শতাংশই এই আইনের ধারাবলে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার এই আইনের বিলোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও তার বাস্তবায়ন ঘটাতে অনেক সমস্যায় পড়েছে তার কারণ প্রশাসন বা বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতাদের একটা বড় অংশ এই আইনের দ্বারা উপকৃত। তবে আশার কথা, কেউ কেউ পরবর্তীকালে অর্পিত সম্পত্তি পুণরায় ফেরত পেয়েছেন। নিরাপত্তাহীনতার আরেকটি রাজনৈতিক কারণের অন্যতম আওয়ামী লীগের প্রতি বাংলাদেশের হিন্দু জনগোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ জনসমর্থন। ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টিতে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ। এই সময়ের নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে আওয়ামী লীগের পক্ষের ও বিপক্ষের মুসলিম ভোটের সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে বেশ কিছু ব্যবধান থাকলেও এই নির্বাচনে তাদের বিরাট জয়ের পিছনে অন্যতম প্রধান অনুঘটক হিন্দু ভোটের প্রায় সবটাই আওয়ামী লীগের ঝুলিতে পড়া। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাক বাহিনীর হাতে নিহত ৩০ লাখ শহীদের, সম্ভ্রমহানি ঘটা ৩ লক্ষ মহিলাদের এবং এইসময়ে নির্বিচারে হত্যা করা বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশই হিন্দু জনগোষ্ঠীর। শুধু ১৯৭০-

এর নির্বাচনই নয়, আওয়ামী লীগের একটা বড় ভোটব্যাঙ্ক সেদেশের হিন্দু ভোট। তাই রাজনীতিগতভাবে আওয়ামী লীগপন্থী হিন্দুদেরকে নির্যাতনের ঘটনা দেখা যায় মূলত নির্বাচনের সময়ে বা আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতায় না থাকাকালীন। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, মারধোর, হত্যা, সম্ভ্রমহানি, মন্দির বা বিগ্রহ ভাঙা, ইত্যাদি ঘটনা এই সময়ে আকছারই নজরে আসে। ২০০৮ সাল থেকে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসীন। কিছু হলেও এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। এর স্বপক্ষে বলা যায় যে বাংলাদেশ পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের অধীনে বিবিএস বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস-এর ২০১৮ সালের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার ৮৮.৪ ভাগ (কিছুটা কমছে) এবং হিন্দু এবং অন্য ধর্মাবলম্বী ১১.৬ ভাগ (বাড়ছে)। যেহেতু বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী মোটামুটিভাবে দীর্ঘদিন ধরে একই রয়েছে তাই হিসেব করে বলা যায় হিন্দু জনগোষ্ঠী এখন মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১০.৬ ভাগ। ২০১৯ সালের বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার নিরিখে হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১ কোটি ৭৫ লাখ। এই হিসেব ধরলে ২০১১ সাল থেকে ৮ বছরে দেশে হিন্দু জনগোষ্ঠী বেড়েছে প্রায় ৩৮ লাখ। তবে এই সংখ্যাটা এতটা বাড়ার কোনো ব্যাখ্যা নেই। আর যেহেতু পরবর্তী আদমশুমারি হবে আগামী ২০২১ সালে তাই এই প্রতিবেদন চূড়ান্ত নয়। বিগত বছরে সারা বাংলাদেশে প্রায় ৩২০০০ দুর্গাপুজো হয়েছে। এটাও একটা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। এই ঘটনাগুলোর পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী একটি রাজনৈতিক দলের দীর্ঘদিন ধরে দেশের শাসন ক্ষমতায় থাকা। সহাবস্থানের ফলশ্রুতিতেই রমনা কালীবাড়ি নতুন করে গড়ে তোলা, একাধিক জায়গায় হিন্দু মন্দিরের সম্পত্তি জোর করে হস্তান্তর করার প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বাধাদান ও হস্তক্ষেপ ইত্যাদি ঘটনা নজরে এসেছে। এ যেন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধুর সেই বিশ্বাসেরই বাস্তবায়ন। দেশের সরকারের প্রকৃত রাষ্ট্রধর্ম পালন। তাই সহাবস্থান ক্রমশ জোরদার হচ্ছে এবং হিন্দু জনগোষ্ঠীর মনকষ্টে ভিটেমাটি ছাড়ার প্রবণতা কিছুটা হলেও কমছে। এরজন্য শাসকদল নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ্য। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল ১৯৭২ সালের সংবিধান ফেরাবার। এখন দেখার তা তারা করতে পারে কিনা। করতে পারলে তাই হবে 'মুজিব বর্ষে' বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার্ঘ্য। 'অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের' পুনরায় জয়যাত্রা।